বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.004

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলাধীন নতুন আবিষ্কৃত ভালাইপুর গণহত্যা: একটি জরিপ প্রতিবেদন

পারভীনা খাতুন*

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর যশোর জেলার অবস্থিতি ভারতের সীমান্ত-নিকটবর্তী হওয়ায় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে। এ অঞ্চলের মুক্তিকামী সাধারণ জনগণের পাশাপাশি একই পথ দিয়ে ভারতগামী বাঙালি শরণার্থীরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর আচার-আচরণ ও পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে রয়েছে হত্যা, গণহত্যা, মৃত বা অর্ধমৃত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়া, নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন, অবাধ লুণ্ঠন, আগুন দিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা ইত্যাদি। সম্ভবত, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে পাকিস্তানি শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে অধিক মাত্রায় প্রতিরোধযুদ্ধ, গেরিলা আক্রমণ, যুদ্ধ, ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনাস্থল হচ্ছে ঝিনাইদহ জেলাধীন (যুদ্ধকালে মহকুমা) মহেশপুর ও ভালাইপুর। অনেক স্পট এখনো অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। ভালাইপুর গণহত্যা ও গণকবর স্থল মহেশপুরের অতি সন্নিকটে। একটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অপরটি অবিচ্ছেদ্যভাবে এসে যায়। এ প্রবন্ধটিও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভালাইপুর গণহত্যা ও গণকবরের বিষয়টি এ পর্যন্ত সকলেরই অজানা ছিল। এটি বর্তমান গবেষক কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত। এখানে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রায় নিয়মিত গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং এর যারা নির্মম শিকার তাদের গণকবরে মাটিচাপা দেওয়া হতো। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু একদিন (২০ মে) সংঘটিত গণহত্যা ও গণকবরের লোমহর্ষক বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গণকবরে মাটিচাপা দেওয়া অর্ধ-মৃত এক ব্যক্তির অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া এবং ঐ দিনের নির্মম ঘটনা সম্বন্ধে তার মুখের বয়ান। পাশাপাশি, এখানকার গণহত্যায় যেসব পরিবার তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে, ঐ সব পরিবারে প্রাণে বেঁচে থাকা সদস্যদের করুণ জীবন-যাপন ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশে সংযুক্ত ৪টি সংযোজনী এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কতিপয় আলোকচিত্র পাঠককে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে, আশা করি, সহায়ক হবে।

চাবি শব্দ: মহেশপুর, ভালাইপুর, গণহত্যা, গণকবর, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ, কপোতাক্ষ নদ, সৃষ্টিপদ হালদার।

প্রারম্ভিক বক্তব্য

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা-নির্যাতন, ধর্ষণ-নিপীড়ন, অগ্নিকাণ্ড, লুটপাট ইত্যাদি চালায়। এ সময় তাদের হাতে ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হন। প্রায় পৌনে ৫ লক্ষ মা বোন লাঞ্ছিত হন।[১] এক কোটি মানুষ প্রাণভয়ে ভিটেমাটি, ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃহত্তর যশোর বাংলাদেশের একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় বহুসংখ্যক শরণার্থী ভারতের শরণার্থী শিবিরে এবং এর বাইরে যত্রতত্র আশ্রয় নেয়। পথিমধ্যে তারা হানাদার বাহিনী দ্বারা নানাভাবে নির্মম নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এ কারণে এখানে গণহত্যা-বধ্যভূমি ও নারী নির্যাতনের সংখ্যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক।[২] বৃহত্তর যশোরের ওপর ইতোমধ্যে যে সকল গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে,[৩] তাতে দেখা যায় এখানে

* শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, যশোর শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর।

হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস হানাদার বাহিনীর গণহত্যার ফলে সৃষ্টি হয় অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এখানে অনেক নির্যাতন কেন্দ্র, বধ্যভূমি ও গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য দুটি গণহত্যা হচ্ছে মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুরে সংঘটিত গণহত্যা। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার ওপর বর্তমান গবেষকের একটি মাঠ পর্যায়ে জরিপভিত্তিক গবেষণাকর্ম অতি সম্প্রতি প্রবন্ধ আকারে খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪] কিন্তু মহেশপুর সংলগ্ন ভালাইপুরে একইসময়ে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তা এখনো অপ্রকাশিত এবং অজানা। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুর যেহেতু পরস্পর সংলগ্ন এবং মহেশপুর গণহত্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য-বিবরণীসহ বর্তমান গবেষকের পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধই প্রথম, সেহেতু পাঠক-গবেষকদের সুবিধার্থে উভয় গণহত্যার যারা শিকার হয়েছেন, তাঁদের তালিকা, ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা পরিশিষ্ট ১-৪ এ দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত অন্যতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ, ১০ খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০২০; মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত*)*, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ, দ্বাদশ খণ্ড* (২০১৩); হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র, ১৫ খণ্ড* (১৯৮২)*;* সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর (*২০০০); বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, *মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান, ৭ খণ্ড* (২০১৫) এসব গ্রন্থে মহেশপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে বাসস্ট্যান্ড গণহত্যা ও ভালাইপুরের গণহত্যা, বধ্যভূমি বা গণকবরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নেই। আসাদুজ্জামান আসাদের *মুক্তিযুদ্ধে যশোর* গ্রন্থেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও, মহেশপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডবলীলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায় ।

ভালাইপুরের ভৌগোলিক অবস্থান

মানচিত্র: মহেশপুর উপজেলা

ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত মহেশপুর উপজেলা ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নগুলি হচ্ছে– এসবিকে ইউনিয়ন, ফতেপুর ইউনিয়ন, পান্তাপাড়া ইউনিয়ন, স্বরূপপুর ইউনিয়ন, শ্যামকুড় ইউনিয়ন, নেপা ইউনিয়ন, কাজিরবেড ইউনিয়ন, বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন, যাদবপুর ইউনিয়ন, নাটিমা ইউনিয়ন, মান্দারবাড়ীয়া ইউনিয়ন ও আজমপুর ইউনিয়ন। ভালাইপুর গ্রামটি এসবিকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। মহেশপুর উপজেলা সদর থেকে ভালাইপুরের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার পূর্বে।

যেভাবে এই গবেষণাকর্ম শুরু

বর্তমান গবেষক ১৫ই মে ২০২২ স্থানীয় একাধিক পত্রিকায় দেখতে পান মহেশপুর উপজেলার উত্তর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদের একটি শাখা কপোতাক্ষ নদ (যা বর্তমানে একটি ক্ষীণধারা) খনন করতে গিয়ে ভেকুরের মাথায় (খনন যন্ত্র) অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি ও হাড় উঠে আসার ঘটনা। এ নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কপোতাক্ষ নদের তীরে দেহাবশেষ পাওয়ার খবরে মানুষ দলে দলে কপোতাক্ষ নদের পাড়ে ভিড় করেন। মুক্তিযোদ্ধা পৌর কমান্ডার আব্দুস সাত্তার এবং মহেশপুর উপজেলা প্রধান নির্বাহী অফিসার নয়ন কুমার রাজবংশী সেদিন (১৫ মে) বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মহেশপুর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হাড় ও মাথার খুলি উদ্ধার করেন এবং ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠান। বর্তমানে উদ্ধারকৃত হাড় ও খুলিগুলো খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা জাদুঘরে সংরক্ষিত। পরবর্তীকালে স্থানীয় কিছু সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে লেখা প্রকাশিত হয়। এভাবেই বর্তমান গবেষক বৃহত্তর যশোরের ঝিনাইদহের মহেশপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড বধ্যভূমিটির সন্ধান পান। এই বধ্যভূমির ওপর গবেষণা করে ভয়াবহ এক চিত্র তুলে আনেন। মহেশপুরের নিকটবর্তী আর একটি স্থান হলো ভালাইপুর। মুক্তিযুদ্ধকালীন সেখানেও একাধিকবার ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। এই ভালাইপুরের গণহত্যা সম্পর্কে কেউ কখনো অনুসন্ধান করেনি। বর্তমান গবেষক খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্টের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার সময় ভালাইপুরের গণহত্যা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে লোকজনের কাছে অবহিত হন। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি হাতে নেয়া হয়। দেখা যায়, এখানকার গণহত্যার ভয়াবহতা, যা এ পর্যন্ত সকলেরই অজানা ছিল।

প্রবন্ধকার প্রথমে যান মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নয়ন কুমার রাজবংশীর অফিসে। সেখানে অনেক প্রবীণ লোক, শহিদ পরিবারের সদস্য, প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত নারী-পুরুষদের জড়ো করা হয়েছিল এবং এদের অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে গ্রামে-গ্রামে সরেজমিনে স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ শুরু করা হয়। মহেশপুর বাসস্ট্যাণ্ড গণহত্যা ও ভালাইপুর গণহত্যা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বধ্যভূমি এবং গণকবর সম্পর্কে সর্বমোট ৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের পাশেই মহেশপুর প্রেসক্লাবের অফিস। মানবাধিকার কর্মী ও প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আব্দুর রহমানের সহযোগিতায় ভালাইপুর গণহত্যার শিকার পরিবারের সদস্যদের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও গণহত্যার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া একজনের কাছ থেকে ঘটনার লোমহর্ষ বিবরণ রেকর্ড করা হয়। এইভাবে নতুন এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্য-উৎস

বর্তমান গবেষণাকর্মে যেসব উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, তা হলো– মাঠ-পর্যায়ে জরিপ, সরেজমিনে সাক্ষাৎকার, গণহত্যার স্পট বা স্থান পরিদর্শন, গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয় প্রশাসন, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভালাইপুর গণহত্যায় যাদের গণকবর দেওয়া হয় তাদের মধ্যে ঘটনাক্রমে বেঁচে যাওয়া একজন–এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ভুক্তভোগী শহিদ পরিবারের সদস্য, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা প্রমুখেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ভালাইপুর গণহত্যার বিবরণ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা মহেশপুরের হাসপাতাল, থানা এবং কলেজে ক্যাম্প স্থাপন করে বাংলার নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস গণহত্যা-নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে গণহত্যা শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল যশোর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মহেশপুরের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল মহেশপুর হাসপাতালে। এর পূর্বে ভালাইপুর গ্রাম, উত্তরে কপোতাক্ষ নদ, পশ্চিমে মহেশপুর শহর। ফরিদপুর, মাগুরা, নড়াইল, যশোর অঞ্চল থেকে শরণার্থীরা খুব সহজেই মহেশপুর ও যাদবপুরের রাস্তা দিয়ে ভারতে যেতে পারত। ২০শে মে অসংখ্য শরণার্থী হেঁটে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদেরকে ধরে ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের ধারে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। লাশ যত্রতত্র পড়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মহেশপুর হাসপাতাল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিল মেজর আব্বাস[৫] ও প্লাটুন কমান্ডার মেজর আনিস খান।[৬] এদের নির্দেশে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন ধরে এনে মহেশপুরের ভালাইপুর, হাসপাতালের পেছন, কলেজ মোড় ও বর্তমান বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি স্থানে হত্যা করা হতো। পরে তাদের গণকবর দিত। আবার কপোতাক্ষ নদের ধারে বা ক্যাম্পে হত্যা করে লাশ নদে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। কিংবা নদের তীরে অসংখ্য গর্ত করা ছিল আর সেই গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হতো। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাণভয়ে অধিকাংশ লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করায় মহেশপুর ও ভালাইপুরসহ সমগ্র উপজেলা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন গ্রাম থেকে কিশোরী, যুবতী ও গৃহবধূদের ক্যাম্পে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার চালাত। যুবতী মেয়েদেরকে তাদের পরনের কাপড় খুলে উলঙ্গ অবস্থায় হাসপাতালের একটি কক্ষে আটক রেখে যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত ধর্ষণ করে। স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বা তাঁদের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করত তাদেরও ধরতে পারলে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা

করত। হত্যা করার পূর্বে দীর্ঘদিন ধরে এইসব যুবকের ওপর নির্যাতন করা হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আশ্রয়দাতাদেরকে নির্যাতন বা হত্যা করত।

জানা যায় যে, ১৫ই এপ্রিল থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩৪ দিনে এক হাজারেরও বেশি মানুষকে মহেশপুর ও ভালাইপুরে হত্যা করা হয়। ভালাইপুর গণহত্যা একাধিকবার সংঘটিত হলেও, বর্তমান প্রবন্ধে একই দিনে (২০শে মে) সংঘটিত দু'বারের গণহত্যার শিকার, গণহত্যার শিকার শহিদ পরিবারের কথা ও ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০শে মে ১৯৭১ মহেশপুরের ফতেপুরের সৃষ্টিপদ হালদার ও তাঁর মামাতো দুই ভাই শিবু হালদার ও দেবেন হালদার এবং এদের দুই ভগ্নিপতি অবনিশ হালদার ও সন্তোষ হালদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ভারতে চলে যান। এ সময় বনগাঁ মুক্তি বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে দেড়মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে ১২ জনের একটি দল মহেশপুরে মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য জলিলপুরে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। জলিলপুরের সোরাব নামে একজন টের পেয়ে মহেশপুর হাসপাতালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে খবর দেয়। ঠিক সন্ধ্যার আগে ২টি গাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা এসে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে যায় আর বাকি ৫ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁদের ওপর নির্মম নির্যাতন শেষে গর্তের মধ্যে ফেলে উপর্যুপরি বেয়োনেট চার্জ করা হয়। তাঁদের সকলকে মৃত ভেবে এবং হঠাৎ বৃষ্টি আসায় সামান্য মাটি চাপা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে। উল্লিখিত ৭ জনের মধ্যে ১ জন ছিলেন সৃষ্টিপদ হালদার (পরিচিতি তথ্য-নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)। তিনি বেয়োনেটের খোঁচায় আহত হলেও জীবিত ছিলেন এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চলে যাওয়ার কিছু সময় পর গণকবর থেকে কোন ক্রমে উঠে পার্শ্ববর্তী একটি বাঁওড় অতিক্রম করে বাড়িতে পৌঁছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন (বিস্তারিত, এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)।

একইদিন (২০শে মে) দুপুর বেলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা মহেশপুরের অরবিন্দু কুমার প্রামাণিক ও সন্নাসী কুমার প্রামাণিককে এদের বাবা, জেঠাসহ ৬ জনকে ভালাইপুর বাঁশবাগানে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঐদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের একই পরিবারের সদস্য ও নিকট আত্মীয় ৭ জনকে ধরে নিয়ে গেলেও, ভাগ্যক্রমে বিনয় কৃষ্ণ দত্ত ওরফে দুলাল (মহেশপুর) প্রাণে বেঁচে যান (বর্তমানে মৃত)। ঘটনা পরবর্তী নিজ পরিবারের সদস্যদের নিকট সেদিনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা তিনি বর্ণনা করেন। সেদিন সেখানে ১৪-১৫ জনকে বেয়োনেটের খোঁচায় রক্তাক্ত করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। পরে স্থানীয়রা একই গর্তে গণকবরে তাঁদের শায়িত করে।

গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারদান কালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নির্যাতিতের সন্তান সন্তোষ কুমার, শহিদের সন্তান অরবিন্দু প্রামাণিক, গণহত্যায় শহিদের স্ত্রী মহারাণী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন প্রমুখ উপরিল্লিখিত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, যা গবেষকের নিকট সংরক্ষিত। তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ প্রবন্ধের শেষাংশে দেওয়া হয়েছে।

ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে হানাদার বাহিনী কত মানুষকে গণকবর দিয়েছিল আর কত লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল তার কোন পরিসংখ্যান নেই। অনেককে বস্তা বন্দি করে নদে ফেলে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেশ মুক্ত হওয়ার পরও পচা লাশ এই নদে ভাসতে দেখেছেন। এলাকাবাসীর মতে, এখানে ৫-৬শ'র বেশি মানুষ গণহত্যার শিকার হন।

২০শে মে ১৯৭১ সালে ভালাইপুরে সংঘটিত উল্লিখিত গণহত্যায় যারা শহিদ ও চরম নির্যাতনের শিকার হন, তাঁদের সকলের নাম ও পরিচয় স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে, যাঁদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, তা পরিশিষ্ট-১ ও ২ এ তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয় অত্যাসন্ন দেখে ৫ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা মহেশপুর হাসপাতাল ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাক্ষাৎকার

গণহত্যার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে আসা সৃষ্টিপদ হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার[৭]

সৃষ্টিপদ হালদারের শরীরে বেয়োনেটের খোঁচার দাগ

সৃষ্টিপদ হালদার (৭৩)

মৎস্যজীবী; গণকবর থেকে প্রাণে বেঁচে আসা মুক্তিযোদ্ধা। গ্রাম: ফতেপুর, ইউনিয়ন ও থানা: মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

বর্তমান গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সৃষ্টিপদ হালদার বলেন:

মুক্তিযুদ্ধকালীন আমরা ভারতের বনগাঁ অস্থায়ী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে ছিলাম। প্রশিক্ষণ শেষে ঐ স্থান থেকে আমাদের একই গ্রুপের ১২ জনকে পাঠানো হয় মহেশপুরে। মহেশপুরের জলিলপুর হালদারপাড়ায় আমরা অবস্থান করি। আমাদের গ্রুপের একজন কমান্ডার ছিল। আমাদের অবস্থানের সংবাদটা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়েছিল স্থানীয় একদল পাকিস্তানপন্থি। তার মধ্যে জলিলপুরের সোরাব অন্যতম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২০শে মে বিকেল ৫ টায় দুটি জীপ গাড়িতে করে এই গ্রামে প্রবেশ করে। হানাদার বাহিনীর সদস্য ছিল ১৫ জন। আমাদের গ্রুপের ৫ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও, আমি সহ ৭ জন ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাদেরকে

গাড়িতে উঠিয়ে বলছিল, 'মুক্তি হ্যায়'। আর কোনো কথা নয়। তারপর ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের তীরে নিয়ে যায়। চারিদিকে অনেক লাশ দেখতে পাই। পরে জেনেছি, ভারতগামী শরণার্থীদের হত্যা করে লাশ যত্রতত্র ফেলে রেখেছে। ঐ স্থানে আগে থেকেই গর্ত খোঁড়া ছিল। বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করছিল 'মুক্তি হ্যায়'! আর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মম নির্যাতন করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। প্রথমে একজনকে গর্তে ফেলার পর আমাকে ফেলল। আমার ওপরে আরও পাঁচ জনের লাশ ফেলল। আমি মারা যাইনি কিন্তু শত কষ্টেও নড়াচড়া করছিলাম না। আমার নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। যাঁদের নাম মনে আছে সেই শহিদরা হলেন– শিবে, দেবেন, অবনিশ ও সন্তোষ হালদার (পরিচিতি পরিশিষ্ট ১-এ দ্রষ্টব্য)। আর দুজনের নাম মনে করতে পারছি না। এরপরও ওরা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই ৫ জন আমার শরীরের উপরে থাকায় আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু বেয়োনেটের খোঁচা অতটা বেশি লাগছিল না। এক-দুই কোদাল মাটি চাপা দেয়ার পরপরই হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দ্রুত গাড়িতে উঠে ঐ স্থান ত্যাগ করল। ওরা চলে যাওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পর আমি আস্তে আস্তে লাশগুলো ঠেলে গর্ত থেকে বের হয়ে আসলাম। তখন সন্ধ্যা ৭টা বাজে। বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্রোলিং করতে করতে বাঁওড়ের অপর পাড়ে বেড়ের মাঠে সারারাত লুকিয়ে থাকলাম। পরদিন সকালবেলা বাড়ি আসলাম। মহেশপুর বাজারে অবস্থানরত আব্দুল আজিজ নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণভয়ে আমাদের বাড়ির পাশে আত্মগোপন করেছিলেন। উনি আমাকে উনার কাছে থাকা ওষুধপত্র দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ঐদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণেই আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ভালাইপুর ব্রিজ পর্যন্ত পুরোটাই বধ্যভূমি। আমার কমান্ডারসহ গ্রুপের সবাইকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করে। আমার এই অবস্থার কথা আমার এলাকার সবাই জানেন। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর আমি আর যুদ্ধে যাইনি, মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিও পাইনি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ আজিজুর রহমানের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার[৮]

মোঃ আজিজুর রহমান (৭৫), পেশাঃ ব্যবসা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রামঃ ভালাইপুর, ইউনিয়নঃ এসবিকে (সুন্দরপুর), থানাঃ মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

তিনি বর্তমান গবেষকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন:

ভালাইপুরের দুটি স্থানে গণকবর দেওয়া হয়। এই দুটি স্থান সম্পর্কে শুধু আমি না, আমাদের বয়সী এবং ভালাইপুরের প্রবীণ লোকজন জানেন। ফতেপুরের সৃষ্টিপদ হালদারসহ কয়েকজনকে পাকিস্তানি হানাদাররা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে গণকবরে ফেলে দেয়। তাদের মধ্যে সৃষ্টিপদ হালদার ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আমি নিজে তাঁকে বাওড় পার করে বাড়ি পৌছে দিতে সাহায্য করি। আবার, মহেশপুরের অনেককে ধরে এনে আমাদের ভালাইপুরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্তে ফেলে। সেখান থেকে দুলাল নামে একজন ২৯টি বেয়োনেটের খোঁচা খেয়েও বেঁচে যায়। তারপর দুলাল ভারতে যেয়ে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হন। অন্যরা সবাই মারা যান। তাঁদেরকে আমরাই মাটি দিয়েছি। একদিন বিকেলে ৫/৭ জনকে হত্যা করে আমাদের সামনে কপোতাক্ষ নদে ফেলে দিল। পরের দিন দেখি তাঁদের লাশগুলো নদীতে ভাসছে। তারা সবাই বাইরের লোক ছিল; তাই নাম জানি না। শুধুমাত্র একজনের নাম শুনেছিলাম। তার নাম ছিল মন্টু। তার বাড়ি কোটচাঁদপুরের হাকিমপুরে। তাকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ১৫ই এপ্রিল থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিদিন আমাদের গ্রামে বহিরাগত মানুষকে ধরে এনে হত্যা করত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত হত্যা, নির্যাতন চলেছে। লাশগুলোকে নদে ভাসিয়ে দিত, কখনো পুঁতে রাখতো, কখনো নদের কচুরির মধ্যে ফেলে দিত। আমাদের গ্রামের একজন নারীকে ৬/৭ জন পাকিস্তানি সেনা ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। তারপর সে অসুস্থ হয়ে যায়। কত মানুষকে যে নির্মমভাবে নির্যাতন করতে দেখেছি, তা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। তাঁদের আর্তনাদ শুনে সহ্য করতে পারতাম না। গণকবরের দুটি স্থানে এখন ধান চাষ করা হচ্ছে।

গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারদান কালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ, শহিদের স্ত্রী কালিদাসী, শহিদ পরিবারের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ হালদার, শহিদের সন্তান বিমল হালদার, শহিদের স্ত্রী যমুনা প্রমুখ সৃষ্টিপদ হালদার ও মোঃ আজিজুর রহমানের ন্যায় ঘটনার প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেন, যা বর্তমান গবেষকের নিকট সংরক্ষিত। তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ প্রবন্ধের শেষাংশে দেওয়া হয়েছে।

গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর জীবনযাপনের হালচিত্র

মহেশপুরের ভালাইপুরে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, সেখানে ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার মানুষ। তবে, যারা স্থানীয় অর্থাৎ ফতেপুর ও অন্যান্য গ্রামের ছিল, তাদের দেখে মর্মাহত হয়েছি। সেখানকার ৫ জন নারীর কেউ ২০, কেউ ২২ কেউ ২৫ এমন বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁদেরকে পরে আর বিয়ে দেওয়া হয়নি। এরা অন্যের সংসারের সন্তান লালন-পালন সহ গৃহকর্মীর কাজ করে কোনক্রমে জীবনধারণ করেন। মহেশপুরের মহারাণী ৩ সন্তান নিয়ে ২৩ বছর বয়সে বিধবা হন। সেভাবেই অনেক কষ্টে সন্তানদের বড় করেছেন। ফতেপুরের একই পরিবারের ৪ জন শহিদ হন । তার মধ্যে শহিদ অবনিশ হালদারের স্ত্রী কালীদাসী দুই শিশু সন্তান নিয়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিধবা হন। শহিদ সন্তোষ হালদারের স্ত্রী যমুনা অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে

মাত্র ৪ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। তারপর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। অনেক কষ্টে এই শহিদ পরিবারগুলো জীবন অতিবাহিত করছে। পুরো একটি হিন্দু পরিবারকে হানাদাররা অভিভাবকশূন্য করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি নারীকেও পরবর্তীতে বিয়ে দেওয়া হয়নি। তারা সেই বয়স থেকে সাদা ধুতি পরিধান করে যাচ্ছেন। এ পরিবারগুলো শুধু তাদের স্বজনদের হারায়নি, হারিয়েছে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে আশ্রয় নিয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। শহিদদের সন্তান ও তাদের বর্তমান অবস্থা দেখলে কেউ অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারবে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই বাবাকে হারিয়েছে সন্তান। অবার শিশু-সন্তানেরা বাবা ডাকা শেখার আগেই বাবাকে হারিয়েছে। তারা লেখাপড়া শিখতে পারেনি। বাঁওড়ে মাছ ধরে কোনভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে শহিদদের সন্তানেরা। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা হুবহু বর্ণনা করে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, স্মৃতিগুলো যেন এখনো তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। ভুক্তভোগীরা নিদারুণ কষ্টে এত বছর পরও স্মৃতিগুলো স্মরণ করে ডুঁকরে ডুঁকরে কেঁদে উঠছেন। অল্প বয়সে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিধবা হওয়া একাধিক নারীর কান্না থামছিল না। তবে, যারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের বেশিরভাগ মৃত্যুবরণ করেছেন।

গণহত্যার পর বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরা অভিভাবকহীন অবস্থায় খুব কষ্টে বড় হয়েছে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে পরিবারের বোঝা টানতে কাজে ছুটতে হয়েছে। শহিদ পরিবারের সন্তানেরা জানায় যে, বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কেটেছে। কখনো সারাদিনে একবেলা খাবার জুটেছে। কত কষ্টে তারা যে বড় হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। অনেক বিধবা নারী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পাগলের মত ঘুরেছেন। যুদ্ধের সময় যেমন সংগ্রাম করে বেঁচেছিলেন, এখনো তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন; তাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি, অব্যাহত আছে। তারা প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে–কীভাবে বেঁচে থাকবেন, পরিবারের মুখে অন্ন জোটাবেন। এক কথায়, অনেক কষ্টে কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে শহিদদের সন্তানেরা। তাদের জীবন-জীবিকার সংগ্রামের যেন কোনো শেষ নেই। কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে তারা আজ পর্যন্ত কোন সহায়তা লাভ করেনি। কেউ এই পরিবারগুলোর কোনো খোঁজও রাখেনি। মুক্তিযুদ্ধের পর অর্থকষ্ট, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, একমাত্র অভিভাবককে হারিয়ে শহিদ পরিবারের জীবন হয়ে পড়েছে চরম দুর্বিষহ।

গণহত্যা স্থল ও গণকবরের বর্তমান অবস্থা

ভালাইপুর ব্রিজ থেকে মহেশপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়েই বধ্যভূমি। এই বধ্যভূমির কথা এলাকাবাসী জানে। আর ভালাইপুরের যে দুই জায়গায় গণকবর আছে, সেখানে কোনো শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়নি। শহিদদের নামের তালিকা বা নামফলকও নেই। সেখানে বাগান ছিল। বাইরের গ্রাম থেকে ধরে এনে এই গ্রামে লোকজনকে

হত্যা করা হয়। সরকারি, বেসরকারি, স্থানীয় বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে কোনো স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়নি। করার কোন পরিকল্পনাও নেই। এখন সেখানে ধান চাষ হচ্ছে।

বর্তমান প্রজন্ম তথা এলাকাবাসীও এখানকার গণহত্যা সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। তাছাড়া, বর্তমান অবস্থায় শহিদদের স্মৃতি সংরক্ষণে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এখানে গণহত্যা দিবস পালন করা হয় না। শুধুমাত্র মহেশপুরের দুলাল আর ফতেপুরের সৃষ্টিপদ, যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে এখানকার গণহত্যার নির্মমতা সম্পর্কে শহিদদের স্বজনেরা ও এলাকাবাসী জানতে পারে। গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, দেশের অনেক বধ্যভূমি ও গণকবরের মতো ভালাইপুর গণহত্যা স্থলও উপেক্ষিত। ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদের পাড় ও মাঠের মধ্যে বাঁশবাগানে দুটি স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হলেও, গণমাধ্যমে এর তেমন কোনো প্রকাশ-প্রচার নেই। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গণকবর দেওয়া হয়। সেসব মুক্তিযোদ্ধা কোনো স্বীকৃতি পাননি।

ভালাইপুর গণকবর দুটি বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা দরকার। এখানে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করে তার গায়ে শহিদদের নাম লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। তাহলে মানুষ জানতে পারবে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা ও শহিদদের আত্মদানের কথা।

সারসংক্ষেপ

কপোতাক্ষ নদ খননের পর মহেশপুর ও ভালাইপুর গণহত্যার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা শেষে ভালাইপুরে গণকবর দেওয়া হয়। আবার জলিলপুর থেকে ধরে এনে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্তে মানুষজন স্তূপ করে রেখে বর্বর হানাদাররা চলে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে অনেক সময় মাটি চাপা দিতে পারেনি।

তৃতীয়ত, এই গণহত্যায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, এর পক্ষের বা সমর্থক বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসররা, আল-বদর ও তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যরা ধরিয়ে দিতে ও তাদের বাড়ি-ঘর শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

চতুর্থত, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইডি কার্ড (‘ডান্ডি কার্ড’ নামে পরিচিত) দেওয়া বা ভিন্ন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিরীহ মানুষকে ধরে এনে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমত, কপোতাক্ষ নদের পাশে ভালাইপুর গ্রাম হওয়ায় অধিকাংশ সময় এখানে মানুষ হত্যা করে নদে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে ভালাইপুর-ফতেপুরের যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন, তাঁদের দলের একজন বাদে সবাই গণহত্যার শিকার হন।

ষষ্ঠত, দেশকে মুক্ত করতে গিয়ে শহিদ হওয়ার পর শহিদদের পরিবারগুলো চরম দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে। শহিদরা পাননি মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি। মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ রাজনীতি এবং নীতি নির্ধারকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহার

যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ার কারণে এখানে অনেক যুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়েছে। শরণার্থীরা এখান থেকে যাওয়ার সময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এখানে অসংখ্য বধ্যভূমি-নির্যাতনকেন্দ্র ও গণকবর রয়েছে। তারমধ্যে মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড ও ভালাইপুরের পাশাপাশি অবস্থান হওয়ায় পুরো এলাকাজুড়ে হত্যাকাণ্ড হয়েছে। পাশাপাশি হলেও দুটি আলাদা স্পট। একটি মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড অপরটি ভালাইপুর গণহত্যাস্থল। প্রথমটি সম্বন্ধে বর্তমান গবেষকের লেখা একটি প্রবন্ধ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ভালাইপুর গ্রাম গণহত্যা এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। এই বধ্যভূমি সম্পর্কে কেউ কোনো লেখালেখি বা গবেষণাকর্ম করেননি। বর্তমান গবেষক এখানকার গণহত্যা ও গণকবরের সর্বপ্রথম সন্ধান পান।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কারো সন্তান, কারো বাবা, কারো ভাই, কারো বোনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তারা আর ফিরে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের ৫৪ বছর পরও শহিদ পরিবারগুলো জানে না কীভাবে, কোথায়, কেমন করে তাদের আপনজনদের হত্যা করা হয়েছে। স্বজন হারানো পরিবারগুলো আজও মনে করে, হয়তো তাঁরা বেঁচে আছেন এবং ফিরে আসবেন। নদী খনন করার সময় ভেকুরের মাথায় (খনন যন্ত্র) উঠে আসা হাড় ও খুলিগুলোর সংবাদ পেয়ে এই পরিবারগুলো ছুটে এসেছিল দেখতে। হয়তো তাদের সেই প্রিয় স্বজনকে এখানেই পুঁতে রাখা হয়েছিল। এটাই হয়তো তাদের প্রিয় বাবা, ভাই, বোন, স্বামী বা সন্তানের খুলি ও হাড়। তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বজন হারানোর বেদনা যে কতটা বেদনাদায়ক, যিনি হারিয়েছেন তিনিই তা উপলব্ধি করতে পারেন।

ভালাইপুর বধ্যভূমি, গণহত্যা, গণকবর এতকাল অনাবিষ্কৃত ছিল। এই প্রথমবার বর্তমান গবেষক তার গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন। পাঠকবর্গ গবেষণাকর্মটি সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে যারা গবেষণা করবেন, তাদের জন্য এই গবেষণাকর্মটি সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস। বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাকর্মটি একটি নতুন সংযোজন।

পরিশিষ্ট ১

ভালাইপুর গণহত্যায় শহিদদের শনাক্তকরণ

ভালাইপুর গণহত্যার শহিদদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। তবে, অসংখ্য মানুষ এখানে হত্যার শিকার হন বলে জানা যায়। তাঁদের পরিচয়ও অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাত। অনেকে ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতগামী শরণার্থী। স্থানীয় শহিদ পরিবারের সদস্যরা মনে করেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা তাদের স্বজন ও অন্যান্যকে ধরে এনে হত্যা করার পর ভালাইপুর কপোতাক্ষ নদে ভাসিয়ে দেয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে তুলে এনে নির্মম নির্যাতনের পর এখানে গণকবর দিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও শহিদ পরিবারের বয়ানে জানা যায়। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহিদের নাম-পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, নিচে তা প্রদত্ত হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
১	অজিৎ কুমার প্রামানিক	কার্তিক চন্দ্র প্রামানিক	মহেশপুর
২	গোবিন্দ কুমার প্রামানিক	কার্তিক চন্দ্র প্রামানিক	মহেশপুর
৩	অবনিশ চন্দ্র হালদার	অজ্ঞাত	ফতেপুর
৪	দুলাল চন্দ্র বনিক	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৫	মন্টু	অজ্ঞাত	হাকিমপুর
৬	শিবে	বসন্ত	ফতেপুর
৭	দেবেন	বসন্ত	ফতেপুর
৮	অবনিশ	অমূল্য	জলিলপুর
৯	সন্তোষ হালদার	সুরিন হালদার	কোটচাঁদপুর

পরিশিষ্ট ২

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

ভালাইপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্যাতিত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের অনেকে বেঁচে আছেন এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও অনেকে জীবিত আছেন। নির্যাতিত কিছু ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বিবরণ
১.	সৃষ্টিপদ হালদার	গোবতীপদ হালদার	ফতেপুর	তাঁর শরীরের ঘাড়, উরু এবং বিভিন্ন জায়গায় বেয়োনেটের খোঁচা আছে। তাঁর ভাষ্য প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।
২.	বিনয় কৃষ্ণ দত্ত (দুলাল)	ইশ্বর নন্দলাল দত্ত	মহেশপুর	তাঁর শরীরে ২৯ জায়গায় বেয়োনেটের খোঁচা ছিল।
৩.	মফিজউদ্দীন ফকির	তাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা	তার বাবাকে ধরে এনে কপোতাক্ষ নদের তীরে হত্যা করা হয়। যখন তার

				বাবাকে হানাদাররা ধরে আনে, তখন সে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করায় তাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তার শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় এবং তা নিয়েই সে বেঁচে আছে।
৪.	বুলি	অজ্ঞাত	ভালাইপুর	তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। ৭/৮ জন পাকিস্তানি সেনা রান্নাঘরে ঢুকে তাঁর উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালায়।

পরিশিষ্ট ৩
মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যায় শহিদদের শনাক্তকরণ

মহেশপুরের বধ্যভূমির শহিদদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে এক হাজারের অধিক মানুষ এখানে হত্যার শিকার হয় বলে জানা গেছে। তাদের অধিকাংশের পরিচয় অজ্ঞাত। সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যাদের নাম-পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, নিম্নে ছক আকারে তা প্রদত্ত হলো:

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
১	আবুল হোসেন বিশ্বাস	ফজলুর রহমান বিশ্বাস	যাদবপুর
২	নুরুল ইসলাম বিশ্বাস	আবুল হোসেন বিশ্বাস	যাদবপুর
৩	মফেজ উদ্দিন	বাবর আলী	গয়েশপুর
৪	সিরাজুল ইসলাম	মফেজ উদ্দিন	গয়েশপুর
৫	তোফাজ্জেল হোসেন	মফেজ উদ্দিন	গয়েশপুর
৬	শামসুল হক মোল্লা	জমির হোসেন মোল্লা	ধান্যহাড়িয়া
৭	দাউদ হোসেন	মফিজ উদ্দিন	কৃষ্ণপুর
৮	আনিচ উদ্দিন	কাবিল হোসেন মন্ডল	কৃষ্ণপুর
৯	নুর আলী	কদম আলী	কৃষ্ণপুর
১০	মোজাম্মেল হক	কাঠু মোল্লা	কৃষ্ণপুর
১১	শাহেদ আলী ব্যাপারী	রজব আলী ব্যাপারী	কৃষ্ণপুর
১২	লুৎফর রহমান	অজ্ঞাত	কৃষ্ণপুর
১৩	নাজিম উদ্দিন	পরশ মন্ডল	মহেশপুর ক্যাম্প
১৪	শেখ জালাল উদ্দিন	-	মহেশপুর
১৫	মোংলা বিশ্বাস	রামলাল বিশ্বাস	জলিলপুর
১৬	গণি হাজি	কলিমদ্দিন ব্যাপারী	পান্তা পাড়া
১৭	লালু দেওয়ান	উসমান দেওয়ান	পান্তা পাড়া
১৮	জালাল	রিয়াজউদ্দীন	জলিলপুর
১৯	মুলা ছুতর	অজ্ঞাত	জলিলপুর

২০	মঈন উদ্দীন	দীন মোহাম্মদ	উড়বাড়ি
২১	রওশন আলী	মোবারেক বিশ্বাস	ভালাইপুর
২২	তোফাজ্জেল হোসেন	ফজলুল করিম	পান্তাপাড়া
২৩	শাজাহান	ইদবার মন্ডল	সাড়াতলা
২৪	মফিজুর রহমান	রাজা মিয়া	ফতেপুর
২৫	বাচ্চু মিয়া	আকবার আলী	ঘুগরি
২৬	সেকেন্দার আলী	জাফর আলী	পান্তাপাড়া
২৭	তবদিন হোসেন	আক্কল আলী	পীরগাছা
২৮	আইউব হোসেন	কেনু মদ্দিন শেখ	সেজিয়া
২৯	হাবিবুল্লাহ্ সরকার	আঃ লতিফ সরকার	রঘুনাথপুর
৩০	সানোয়ার রহমান	কালু মন্ডল	মান্দারবাড়িয়া
৩১	খোকা	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৩২	মোঃ মফিজউদ্দিন	মোবারক মন্ডল	ভবনগর
৩৩	অহেদ আলী	কালুপাচু	জলিলপুর
৩৪	হেমন্ত মিস্ত্রি	অজ্ঞাত	মহেশপুর
৩৫	আহম্মদ আলী	হাসান আলী	যোগীহুদা
৩৬	আঃ আজিজ	জনাব আলী	যোগীহুদা
৩৭	আঃ হাই	হাফিজ মৌলবী	যোগীহুদা
৩৮	শামসুর রহমান	আহম্মদ আলী	যোগীহুদা
৩৯	হাসমত আলী	ঈমান আলী	যোগীহুদা
৪০	তাজউদ্দিন ফকির	আফাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা

পরিশিষ্ট ৪

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডের পার্শ্ববর্তী হাসপাতাল ক্যাম্পে হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের অনেকে এখনো বেঁচে আছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও অনেকে জীবিত রয়েছে। আবার, অনেকে ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। নিচে নির্যাতিত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের তালিকা (অসম্পূর্ণ) প্রদত্ত হলোঃ

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	বিবরণ
১	কাজী আব্দুল জলিল	কাজী আব্দুল আলিম	মহেশপুর	তাঁর ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার কারণে ৪দিন তাঁকে ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সে যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছেন। ছেলেকে হানাদারদের হাতে যে-কোনো সময় তুলে দেবেন মর্মে লিখিত দিলে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

২	মোহাঃ সিদ্দিক মাস্টার	অজ্ঞাত	উজ্জলপুর	পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে হাসপাতালের ক্যাম্পে আটক রেখে নির্যাতন করে। একদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ওখানকার পাহারারত সৈনিকরা ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের তিন জনকে যে কক্ষে আটকে রেখেছিল তার জানালাগুলো ছিল দুর্বল। তাই, তারা বৃষ্টির মধ্যে জানালা ভেঙে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
৩	মোছাঃ আকলিমা খাতুন	আঃ রশিদ মিয়া	উজ্জলপুর	বর্ণির আব্দুল মান্নান রাজাকার তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে দেয়। ক্যাম্পে হানাদার বাহিনী কর্তৃক ৪দিন পাশবিক নির্যাতন শেষে ছাড়া পান।
৪	রোকেয়া খাতুন	জুলহাস	উজ্জলপুর	বর্ণির আব্দুল মান্নান রাজাকার তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে দেয়। ক্যাম্পে রেখে ৪ দিন পাশবিক নির্যাতনের পর ছাড়া পান।
৫	আবুল কাশেম			হানাদারদের ক্যাম্পে রেখে তার ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়।
৬	ঝড়ু			ক্যাম্পে রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়। তৎকালীন ইউনিয়ন পরিষদ সভাপতি মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।
৭	সামছুল ফকির	তাজউদ্দিন ফকির	যোগীহুদা	তার পায়ে বন্দুকের বাট দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ড নির্যাতন করে। এখনও তাঁর পা বাঁকা হয়ে আছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ

সৃষ্টিপদ হালদার (৭০)

পেশাঃ মৎস্যজীবী, গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা। পিতাঃ গোবতীপদ হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ মহেশপুর, থানাঃ মহেশপুর, জেলা ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৮জুন ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ (৭০)

পেশাঃ কৃষি। পিতাঃ জবেদ আলী বেপারী, গ্রামঃ ফতেপুর (বেড়ের মাঠ), ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা, থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষ, ৬ জুন ২০২২

কালিদাসী (৭৫)
পেশাঃ গৃহকর্মী ও শহিদের স্ত্রী। পিতাঃ বসন্ত হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

গোবিন্দ (৬৩)
পেশাঃ মৎস্যজীবী। পিতাঃ ভূপতি কুমার হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

ধীরেন্দ্রনাথ হালদার (৬৮)
পেশাঃ মৎস্যজীবী, শহিদ পরিবারের সদস্য। পিতাঃ বসন্ত হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

বিমল হালদার (৫৫)
পেশাঃ মৎস্যজীবী, শহিদের সন্তান। পিতাঃ অবনিশ হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

যমুনা (৭১)
পেশাঃ গৃহকর্মী, শহিদের স্ত্রী। পিতাঃ বসন্ত হালদার, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

সন্তোষ কুমার (৬০)
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, নির্যাতিতের সন্তান। পিতাঃ বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, গ্রামঃ মহেশপুর পোস্ট অফিসপাড়া, ডাকঘরঃ মহেশপুর, থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১১ জুন ২০২২

অরবিন্দু প্রামানিক (৬৫)
পেশাঃ কৃষি, শহিদের সন্তান। পিতাঃ শহিদ অজিত কুমার প্রামাণিক, গ্রামঃ মহেশপুর, ডাকঘর ও থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, মহেশপুর ৬ জুন ২০২২

মহারাণী (৭৫)
পেশাঃ গৃহিণী, গণহত্যায় শহিদের স্ত্রী। পিতাঃ ননি প্রামাণিক, গ্রামঃ মহেশপুর, ডাকঘরঃ মহেশপুর, থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, মহেশপুর, ৬ জুন ২০২২

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন (৬৭)
পেশাঃ চাকরি (অবসরপ্রাপ্ত), পিতাঃ মৃত নূর-বকসো দফাদার, গ্রামঃ মহেশপুর, ডাকঘরঃ মহেশপুর, থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষ, মহেশপুর, ৬ জুন ২০২২

মোঃ আব্দুর রহমান (৬০)
পেশাঃ মানবাধিকার কর্মী ও সভাপতি, মহেশপুর প্রেসক্লাব। পিতাঃ ইমান আলী ধাবক, গ্রামঃ ফতেপুর, ডাকঘরঃ কানাইডাঙ্গা, থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ অফিস, ১১ জুন ২০২২

মোঃ আজিজুর রহমান (৭০)
পেশাঃ ব্যবসা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। পিতাঃ হানেফ আলী বিশ্বাস, গ্রামঃ ভালাইপুর, ইউনিয়নঃ এস কে বি (সুন্দরপুর), থানাঃ মহেশপুর, জেলাঃ ঝিনাইদহ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৩ জুলাই ২০২২

বই ও গবেষণাকর্ম

আলোকচিত্র
(পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের ক্যাম্প, গণহত্যাস্থল, উদ্ধারকৃত হাড়-গোড়)

১. মহেশপুরের এই হাসপাতালে ছিল পাকিস্তানি সেনাক্যাম্প।
এখানে ১৫০ জনের মতো পাকিস্তানি সেনা অবস্থান করত

২. মুক্তিযুদ্ধকালে মহেশপুর হাইস্কুলে রাজাকার ক্যাম্প

৩. মুক্তিযুদ্ধকালে মহেশপুর থানায় রাজাকার ক্যাম্প

৪. ভালাইপুরে কপোতাক্ষ নদের তীর থেকে উদ্ধারকৃত খুলি ও হাড়।
খুলনাস্থ ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন জাদুঘর ও আর্কাইভস-এ সংরক্ষিত

৫. ভালাইপুর গণকবর স্থল (বর্তমানে চাষের জমি)

৬. মহেশপুর বাসস্ট্যান্ডে কপোতাক্ষ নদের তীর থেকে প্রাপ্ত খুলি ও হাড়

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী', হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০২০, পৃ. ১৫৪; আরও দ্রষ্টব্য, সুরমা জাহিদ, জান্নাত-এ ফেরদৌসী ও হারুন-অর-রশিদ, 'মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনা', হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৭৬

২ দ্রষ্টব্য, পারভীনা খাতুন, 'মুক্তিযুদ্ধে যশোরে গণহত্যা ও নির্যাতন', জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভের উপসংহার।

৩ আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৪; সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী ২০০০; *বাংলাদেশ সেনাবাহিনী*, *মুক্তিযুদ্ধে সামরিক অভিযান*, ৭ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিকেশন ২০১৫; সুকুমার বিশ্বাস, *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*, ঢাকা: সুবর্ণ ২০০১; রুকুনউদ্দৌল্লাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী ২০১৭; সাজেদ রহমান, *রণাঙ্গনে যশোর*, ঢাকা: আজকের বই পাবলিকেশন ২০২২; আরও দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ১০ খণ্ড; মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা, সময় প্রকাশন ২০১৩; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র*, ১৫ খণ্ড, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

৪ মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড গণহত্যার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে বর্তমান গবেষক প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত, গণহত্যায় শহিদ পরিবারের স্বজন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দ্রষ্টব্য, পারভীনা খাতুন, 'মহেশপুর বাসস্ট্যাণ্ড গণহত্যা'. গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ৫; ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০২২, পৃ. ৭৮-১২৫

৫ মহেশপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্লাটুন কমান্ডার ছিল কুখ্যাত মেজর আনিছ খান। তার নির্দেশে সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন ধরে আনত। এনে নির্যাতন কক্ষে বন্দি করে রাখতো। সেখান থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কয়েকজনকে বের করে নিয়ে কপোতাক্ষ নদের তীরে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার মধ্যে তাদেরকে ফেলে দিত। কেউ কেউ মারা যেত, আবার কাউকে অর্ধমৃত অবস্থায় মাটিচাপা দিত।

৬ মেজর আব্বাস ছিল মহেশপুর হাসপাতাল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে। নিষ্ঠুর-নির্দয় হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল। স্থানীয় রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের সহযোগিতায় সে নিরীহ মানুষদের ধরে এনে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করত, হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাত। শুরুতে হিন্দুদের দেখলেই মেরে ফেলত। পরে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাঁদের পরিবারের লোকদের হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে।

৭ সৃষ্টিপদ হালদার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: তাঁর নিজ বাড়ি, ৮ই জুন ২০২২

৮ মোঃ আজিজুর রহমান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: তাঁর নিজ বাড়ি, ৩রা জুলাই ২০২২